চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাস চেতনার পদসঞ্চার

(মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয় ও চন্দ্রশেখর)

।। মৃণালিনী ।।

দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় ইতিহাস উপন্যাসের রোমান্টিক পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ; ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের বিশেষ কোন ভাব বা ভাবনা সেখানে যুক্ত নয়। কিন্তু মৃণালিনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস–চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বদেশ–চিন্তা। যা পরবর্তী উপন্যাস - সমূহে বিশেষত আনন্দমঠ ও সীতারামে প্রসারতা পেয়েছে। ডঃ ভবতোষ দত্ত বলেছেন – " মৃণালিনী (১৮৬৯) রচনাকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন ইতিহাস–সন্ধানী মন জেগে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা বর্ণনায়। এ বর্ণনা নিশ্চয়ই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধ শিলালিপির বিবরণ, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কৌটিল্য ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত।"[১]

মৃণালিনী উপন্যাস বখতিয়ার খিলজির বঙ্গজয়ের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা হয়েছে এই ভাবে — হেমচন্দ্র দিল্লী থেকে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গজয়ের উদ্যোগ–সংবাদ সংগ্রহ করে ফেরার পথে মথুরাতে মৃণালিনীর দেখা না পেয়ে, ক্ষুব্ধ হয়ে, মাধবাচার্যের সঙ্গে দেখা করলেন। হেমচন্দ্রের কাছে সংবাদ পেয়ে মাধবাচার্য রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছে নিবেদন করলেন যে, যবনেরা গৌড় অধিকার করতে আসছে সুতরাং ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা তাঁর অসামর্থ্যের কথা জানালেন এবং রাজ–সভাপণ্ডিত বললেন যে, শাস্ত্রে লেখা আছে যে তুরকীয়েরা গৌড়–জয় করবে। মাধবাচার্যের চেষ্টা বিফল হল।

যথা সময়ে বখতিয়ারের 'সপ্তদশ অশ্বারোহী'র দ্বারা রাজপুরী অতর্কিতে আক্রান্ত হল। যবনেরা পুরমধ্যে যাকে যেখানে পেল হত্যা করতে লাগল। বৃদ্ধ রাজা তখন আহারে বসেছিলেন। কোলাহল শুনে বিচলিত হলেন। এমন সময় সংবাদ এল যে, যবনেরা রাজ-

পুরীর অন্য সকলকে হত্যা করে বৃদ্ধ রাজাকে বধ করতে আসছে। এই সংবাদ শুনে বৃদ্ধ রাজার 'মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ' করে খিড়কি দরজা দিয়ে সুবর্ণগ্রামে পালালেন। তখন "ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।" [২] এবং "সেইদিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ জয় সম্পন্ন হইল।" [৩]

লক্ষ করার বিষয় এই যে, 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সচেতন ভাবেই বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গজয়ের কথা বলেন নি। এই উপন্যাসে সপ্তদশ অশ্বারোহীর 'গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার' এবং 'বিংশতি সহস্র যবন' সেনার নবদ্বীপ জয়ের কথা বলা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে যিনি সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনীর প্রতিবাদ করে লিখবেন যে, "সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন।" [৪] এবং "বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করে নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।" [৫] তার বীজ মৃণালিনী উপন্যাসেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়।

তুর্কীদের বাংলাজয়ের সর্বপ্রাচীন বিবরণ আমরা পাই মিনহাজউদ্দীন রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে। ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার সে বিবরণের যে সারমর্ম দিয়েছেন তা' নিম্নরূপ :-

" বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পরে তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি নুদীয়ায় পৌঁছিল। দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বলিলেন, 'শাস্ত্রে লেখা আছে, তুরস্কেরা এ দেশ জয় করিবে, এবং তাহার কাল উপস্থিত সুতরাং অবিলম্বে পলায়ন করাই সঙ্গত।' রাজার প্রশ্নোত্তরে তাঁহারা জানাইলেন যে, এই তুর্কী বিজয়ীর চেহারা কিরূপ, তাহাও শাস্ত্রে লেখা আছে। গুপ্তচর পাঠাইয়া বখ্‌তিয়ারের আকৃতির বিবরণ আনান হইলে দেখা গেল যে, শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তখন বহু ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ নুদীয়া হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু রাজা লখমনিয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

ইহার এক বছর পরে বখ্‌তিয়ার একদল সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া বিহার হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি এরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, যখন অতর্কিত ভাবে তিনি সহসা নুদীয়া পৌঁছিলেন, তখন মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারিয়াছিল ; বাকী সৈন্যদল পশ্চাতে আসিতেছিল। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া বখ্‌তিয়ার কাহাকেও কিছু না বলিয়া এমন ধীরেসুস্থে সঙ্গিগণসহ সহরে প্রবেশ করিলেন যে, লোকেরা মনে করিল, সম্ভবত ইহারা একদল সওদাগর, অশ্ববিক্রয় করিতে আসিয়াছে। বখ্‌তিয়ার যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন বৃদ্ধ রাজা লখমনিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেছিলেন। সহসা প্রাসাদদ্বার এবং নগরীর অভ্যন্তর হইতে তুমুল কলরব শোনা গেল। লখমনিয়া এই কলরবের প্রকৃত কারণ জানিবার পূর্বেই বখতিয়ার সদলে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া রাজার অনুচরগণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। বখ্‌তিয়ারের সমুদয় সেনা নুদীয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ নগরী ও তাহার চতুস্পার্শ্ববর্তী স্থান সমুদায় অধিকার করিল এবং বখতিয়ারও সেখানেই বসতি স্থাপন করিলেন। ওদিকে রায় লখমনিয়া সঙ্কনাৎ ও বঙ্গের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় অল্পদিন পরেই তাঁহার রাজ্য শেষ হইল, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ এখনও বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছেন।" [৬]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মিনহাজের ইতিহাস পাঠ করে 'মৃণালিনী' উপন্যাস রচনা করেন নি। কারণ, মিনহাজের ইতিহাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।

'মৃণালিনী' তার অনেক আগেই রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর ঐতিহাসিক অংশের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন স্টুয়ার্টের History of Bengal থেকে। যদিও স্টুয়ার্টেরও ভিত্তি ছিলেন মিনহাজ। স্টুয়ার্ট লিখেছেন --

"In the 599th year of the Hejira, the Mohammedans having bonquered the province of Behar, and extended their ravages to the borders of Bengal, the Brahmans and astrologers waited on the Raja (i.e. Raja Luchmunyah), and represented that their ancient books contained a prophecy that the Kingdom of Bengal should be subdued by the Toorks; that they were convinced the appointed time was now arrived; and adviced him to remove his wealth, family and seat of government (then at Nuddeah), to a more secure and distant part of the country, where they might be safe from sudden incursion of their enemies.

The Raja, on hearing this representation, asked the Brahmans if their books gave any description of the person who was to be conqueror of his dominions. They replied in the affirmative, and, that the description exactly corresponded with the person of the Mohammedan General then in Behar (Mohammed Bukhtyar Khulijy).

The Raja, being far advanced in years, and partial to his capital, would not listen to their advice, and took no measures to avoid the danger ....

In the year 600, Mohammed Nukhtyar Khulijy, having acquired sufficient information of the unguarded stale of Bengal, secretly assembled his troops; and marching from Behar, proceeded with

such expedition towards Nuddeah, that his approach was not even suspected.

On his arrival in the Vicnity of the city, he concealed his troops in a wood, and, accompained by only seventeen horsemen, entered the city. On passing the guards, he informed them that he was an envoy, going to pay his respects to their master.

He was thus permitted to approach the place; and having passed the gates, he and his party drew their swords, and commenced a slaughter of the royal attendants.

The Raja Luchmunyah, who was then seated at diner alarmed by the cries of his people made his escape from the palace by a private door, and, getting on board a small boat, rowed with the utmost expedition down the river.

The remainder of the Mohammedan troops now advanced, and, having slanghtered a number of the Hindoos, took possession of the city and palace." ৭

তুর্কীরা বঙ্গবিজয় করবে — এই শাস্ত্রবাক্য বিষয়ে মিনহাজ এবং মিনহাজ অনুসারী স্টুয়ার্টের বর্ণনায় স্বাভাবিক ভাবেই মিল আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও 'মৃণালিনী' উপন্যাসে এই শাস্ত্রবাক্য বিষয়ে স্টুয়ার্টের বর্ণনার অনুসরণ করেছেন (দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। তবে কোন কোন বিষয়ে মিনহাজের বর্ণনার সঙ্গে স্টুয়ার্টের বর্ণনার কিছু পার্থক্যও আছে। যেমন, মিনহাজ লিখেছেন যে, বখতিয়ার এত দ্রুত বিহার থেকে নদীয়ায় আসেন যে, তাঁকে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী অনুসরণ করতে পারে এবং তারা অশ্ববিক্রেতার পরিচয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করে। আর স্টুয়ার্ট লিখেছেন যে বখতিয়ার তার সেনাবহিনীকে এক অরণ্যমধ্যে লুকিয়ে রেখে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ রাজপ্রতিনিধির দূত হিসাবে নদীয়ায়

প্রবেশ করে। স্টুয়ার্টের অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে মহাবনে যবন সৈন্যের শিবির স্থাপনের কথা যেমন বলেছেন তেমনি উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সপ্তদশ অশ্বারোহীর রাজদ্বারে উপনীত হয়ে দৌবারিকের কাছে নিজেদের যবন--রাজপ্রতিনিধির দূত পরিচয় গৌড়েশ্বরের সাক্ষাৎ প্রার্থনার কথাও বলেছেন।

কিন্তু " বখতিয়ার খিলিজি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সহ বঙ্গদেশ জয় করেন, এই কাহিনী বা গল্প বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালী জাতির শৌর্য--বীর্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। উক্ত জাতীয় কলঙ্ক বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।"[৮] সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয় - কাহিনী সম্পর্কে 'মৃণালিনী' উপন্যাসে তিনি মন্তব্য করেছেন — " ষাট বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিনূহাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা তাহা কে জানে ? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত ? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।" [৯] ঠিক একই বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও বলেছেন — " নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।" [১০] সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরাও সংশয় প্রকাশ করেছেন।[১১]

সম্ভবত ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি নদীয়া আক্রমন করেন। এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে মিনহাজ লক্ষ্মণাবতী নগরে এসে দু'জন মগধ অভিযানকারী বৃদ্ধ সৈনিকের মুখ থেকে বখতিয়ারের মগধ অভিযান ও বিজয় কাহিনী শুনে তা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু বখতিয়ারের সঙ্গে নদীয়া অভিযানে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির

বিবরণ মিনহাজ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তিনি বখ্‌তিয়ারের নদীয়া অভিযান বিষয়ে কোনো নিশ্চিত বিবরণ বা দলিলও সংগ্রহ করতে পারেন নি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, আজ পর্যন্তও তেমন কোন দলিল সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। মিনহাজের রচনাই আমাদের এক-মাত্র ভরসা। মিনহাজ জানিয়েছেন যে, বখ্‌তিয়ারের নদীয়া অভিযান ও বিজয়কাহিনী তিনি বিশ্বাসী লোকেদের কাছ থেকে শুনেছিলেন।

এই বিশ্বাসী লোকেরা মিনহাজকে রাজা লক্ষ্মণসেনের জন্ম বিষয়ে এক অদ্ভুত কাহিনীও শুনিয়েছিলেন। তাদের কাহিনী অনুসারে, লক্ষ্মণসেন, তাঁর পিতার মৃত্যুর সময়ে মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁর জন্মকাল উপস্থিত হলে দৈবজ্ঞরা গণনা করে বললেন যে, যদি এই শিশুর এখনই জন্ম হয়, তবে সে কখনই রাজা হবে না, কিন্তু আর দুই ঘন্টা পরে জন্মালে সে আশি বছর রাজত্ব করবে। এই কথা শুনে রাজমাতার নিজের আদেশ অনুসারে, তাঁর দু'পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে করে তাঁকে ঝুলিয়ে রাখা হল। শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে তাঁকে নামান হয়, কিন্তু পুত্র প্রসবের পরেই তার মৃত্যু হল। রায় লখমনিয়া আশি বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং হিন্দুস্থানের এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। [১২]

যে বিশ্বাসী লোকেরা মিনহাজকে অষ্টাদশ অশ্বারোহী সহযোগে বখতিয়ারের বঙ্গবিজয় কাহিনী শুনিয়েছিল তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিমান কতটা ছিল তা আমরা লক্ষ্মণসেনের অদ্ভুত জন্ম কাহিনী ও আশি বছর রাজত্ব করার কথা থেকেই অনুমান করতে পারি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, মিনহাজ কথিত অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বখতিয়ারের বঙ্গবিজয় " কাহিনীর মধ্যে অনেক সুপরিচিত প্রবাদ কথা ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ আছে। 'তুরস্ক আক্রমণ সম্বন্ধে হিন্দুর শাস্ত্রবাণী' চচ্‌নামা নামক গ্রন্থে সিন্ধুদেশ সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রবাণীর মূল্য যাহাই হউক, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নদীয়া আক্রমণের অন্তত এক বৎসর পূর্বে ইহার সম্ভাবনা রাজকর্মচারীরা জ্ঞাত ছিলেন। অথচ বখতিয়ার বিহার হইতে নদীয়া পৌঁছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহার অভিযানের কোন সংবাদ রাজদরবারে পৌঁছিল না। যে সময় তুরস্কসেনা কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেই সময় রাজধানীর দ্বাররক্ষীরা ১৮জন অশ্বারোহী তুর্কীকে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিতে দিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বর্মাবৃত সৈন্যকে অশ্বব্যবসায়ী বলিয়া ভুল করিল ; নগররক্ষীরা কোন সন্দেহ করিল না এবং বখতিয়ার বিনা বাধায়

রাজপ্রাসাদের তোরণ পর্যন্ত পৌঁছিলেন। যখন বখ্‌তিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যদল নগরে প্রবেশ করিল, তখনও এই অগ্রগামী ১৮ জন অশ্বারোহীকে সন্দেহ করিয়া কেহ তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না। রাজার দেহরক্ষী বা সৈন্যদল অবশ্যই ছিল। যখন রাজা স্বয়ং নদীয়াতে ছিলেন, তখন অন্তত একদল রাজসৈন্য নিশ্চয়ই তাঁহার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল, অথচ বখতিয়ারের সৈন্যদলের কাহারও গায়ে একটি আচড়ও লাগিল না, তাহারা স্বচ্ছন্দে বিনা বাধায় হত্যাকান্ড ও লুণ্ঠন কার্য চালাইতে লাগিল। এ সমুদয় এতই অস্বাভাবিক যে, খুব দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত সত্য বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব।" [১৩]

তবে এই অসম্ভব কাজ কি ভাবে সম্ভব হল সে সংক্রান্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য আজও আমাদের অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — " বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না ; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয় স্থান।" [১৪] পরবর্তীকালে, প্রসঙ্গক্রমে, অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখেছেন যে, — "বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গ সেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাস মাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধজয় হয় নাই। একটা রঙ তামাশা হইয়াছিল।" [১৫] নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে প্রকৃত অর্থে রঙ—তামাশা হয়েছিল। কারণ, না হলে মাত্র তিন হাজার একশ সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ নবাব সিরাজদ্দৌলার ৫০টি কামান এবং ৫০ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতেন না। [১৬]

এই অসম্ভব যুদ্ধজয় আমরা সত্য বলে স্বীকার করি, কারণ, এর পিছনে খুব দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। কিন্তু সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গ—জয়ের কাহিনীর পিছনে খুব দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। অথচ সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক নদীয়া আক্রমণ ও লুণ্ঠনকে অস্বীকার করা যায় না। তাই 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মিনহাজের অনুসারী স্টুয়ার্টের বর্ণনাকে অবিকৃত রেখে সপ্তদশ অশ্বারোহী পাঠান সেনা কর্তৃক বঙ্গ—জয়ের কাহিনীর নেপথ্যে 'দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর রূপে কথিত', গৌড়দেশের ধর্মাধিকার, অসাধারণ ব্যক্তি-

পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতারূপ কাহিনীর কল্পনা যুক্ত করেছেন। এর ফলে একটি ঐতিহাসিক তথ্যের অসম্পূর্ণতা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ঐশ্বর্যে বিশ্বাসযোগ্য পূর্ণতা লাভ করেছে।

এই উপন্যাসের প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক নিন্দিত 'রাজকুল-কলঙ্ক' রাজা লক্ষ্মণসেন। তিনি, তাঁর পিতা, রাজা বল্লালসেনের ইচ্ছাক্রমে ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। সে সময়ে লক্ষ্মণসেনের বয়স ৬০ বছর। যৌবনে তিনি মহাপরাক্রান্ত বীরযোদ্ধা এবং রণকুশল সমরনায়ক ছিলেন। পিতামহ বিজয়সেনের আমলেই তিনি কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন। পিতার রাজত্বকালে তিনি গৌড় রাজ্য সম্পূর্ণরূপে সেন রাজাদের অধিকারে আনেন। সিংহাসনারোহণের পর তিনি গাহড়বাল রাজকে পরাজিত করে গয়া অধিকার করেন এবং কাশীরাজাকে পরাজিত করে কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তিনি বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে সারা জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ধর্মপাল ও দেবপালের পরে বাংলাদেশের আর কোনো রাজা লক্ষ্মণসেনের মত যুদ্ধ সাফল্য লাভ করেন নি। লক্ষ্মণসেন নিজে সুকবি ও বিদ্বান ছিলেন। জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিরা তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর মহাপরাক্রমে রাজত্ব করার পর প্রায় ৮০ বছর বয়সে বৃদ্ধরাজা গঙ্গাতীরে ধর্মচর্চার মানসে নবদ্বীপে বসবাস শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই মুসলমান আক্রমণ হয়। নবদ্বীপ থেকে পলায়ন করার পর বৃদ্ধরাজা আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। খুব সম্ভব ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

'মৃণালিনী' রচনার সময় থেকেই 'মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি'র জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে ব্যাকুলতার জন্ম নিয়েছিল। 'মৃণালিনী' রচনার পর তিনি গভীর ভাবে ইতিহাস পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। একদা কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে বলেছিলেন — "মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি।"[১৭] বাংলার ইতিহাসহীনতার জন্য তাঁর অন্তরে গভীর বেদনা ছিল এবং বাংলার ইতিহাসহীনতার কলঙ্কমোচনের জন্য তিনি 'শত্রুহস্ত' থেকে 'চিত্রফলক' আপন হাতে তুলে নেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং প্রথম সংখ্যা থেকেই ইতিহাস

বিষয়ক প্রবন্ধ পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মিনহাজ-উদ্দীন কথিত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গ-জয়ের কাহিনী বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ হইতে পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজীর বঙ্গ-বিজয়ের অসম্ভবতা প্রমাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখনও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র কোন বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয় নাই, 'বাভার্টি'র অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই, তখন ইলিয়ট্ কর্তৃক প্রকাশিত 'তাজ-উল-মাসি'র ও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র সারাংশ মাত্রই এতদ্দেশীয় লেখক ও পাঠকবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বঙ্কিম-চন্দ্র বাঙ্গালার মুসলমান বিজয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।" [১৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা' স্বদেশানুরাগের তুলিকায় রঞ্জিত। মৃণালিনী উপন্যাসেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশানু-রাগের প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করি। 'মৃণালিনী' রচনার কিছুকাল আগে থেকেই বাংলাদেশে, বাঙালির মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ দেখা যাচ্ছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় স্বদেশচর্চার বীজটি প্রথম অঙ্কুরিত হতে দেখা গেল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বেল-গাছিয়ায় সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এ সবের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু তিনি খুব সম্ভব মনে মনে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হল। ইতিহাসের তথ্যানুসারে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদের হাতে বাংলার পরাজয়ের কথা লিখলেন । কিন্তু সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন — "যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না ? উদয় অস্ত উভয়ই ত' স্বাভাবিক নিয়ম ।" [১৯] বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যই 'মৃণালিনী'কে স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিশিষ্ট করেছে।

॥ যুগলাঙ্গুরীয় ॥

'বঙ্কিম-জীবনী'র রচয়িতা শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন — "তাম্রলিপ্তের ঘটনা লইয়া যুগলাঙ্গুরীয় রচিত। যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হইবার প্রায় পনর বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তমলুকে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তমলুকের ম্যাজিষ্ট্রেট। তমলুক পূর্বে যখন তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত ছিল, তখন সমুদ্র তমলুকের পদধৌত করিত।

এক্ষণে সমুদ্র অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। সমুদ্র গিয়াছে, রূপনারায়ণ আসিয়াছে। কোথা হইতে কবে এ বিপুলকায় নদ আসিয়া তমলুকের পদনিম্নে গ্রহণ করিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে আসিলেন, তখন তমলুকে সে বাণিজ্য নাই, সে শ্রী নাই ; কিন্তু স্মৃতি আছে।" [২০]

'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রী ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু তবু যুগলাঙ্গুরীয়কে আলোচনার অর্ন্তভূত করার কারণ, প্রথমতঃ এর কাহিনী দূর অতীতের - খুব সম্ভব খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের আগের। দ্বিতীয়ত: এ কাহিনীর কেন্দ্রভূমিতে আছে প্রাচীন বাংলার অতি-বিখ্যাত সমুদ্র-বন্দর 'তাম্রলিপ্ত'।

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাম্রলিপ্তের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন — " বাংলাদেশের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি ; সেই তাম্রলিপ্তি বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে মুখে, পুঁথির পাতায় পাতায়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙ ও ইৎ-সিঙ তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বা কোনও হিসাবেই তাম্রলিপ্তির উল্লেখ অষ্টম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না।" [২১]

যুগলাঙ্গুরীয়তে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে তাম্রলিপ্তে শ্রেষ্ঠীদের বসবাসের কথা, তাদের বাণিজ্যার্থে সিংহল যাত্রার কথা, সমুদ্রতীরবর্তী সুনির্মিত বৃক্ষবাটিকার কথা,

অপূর্বদর্শন মহাপ্রভায়ুক্ত হীরক হারের কথা বলেছেন তাতে এই কাহিনী তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির সময়ের অর্থাৎ অষ্টম শতকের আগের কাহিনী বলেই মনে হয়। রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি ভিন্ন বাণিজ্যে সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। যুগলাঙ্গুরীয়ের কালে তাম্রলিপ্তে সুশাসন ও শান্তি বিরাজিত। রাজা কেবল বীর্যবান নন ; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় — " রাজা পরম ধার্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে পারে না।" [২২]

যোগেশ চন্দ্র বসু তাঁর 'বঙ্কিম স্মৃতি চিহ্ন' গ্রন্থে লিখেছেন — " বাঙালীর বাণিজ্যপোত সেদিন কত দেশের রত্ন ভান্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় শত সৌদচূড়ায় সে বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসে, তাম্রলিপ্তের সেই গৌরবময় যুগের এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র ও এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার প্রণয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" [২৩]

বঙ্কিমচন্দ্র যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রভূমি হিসাবে 'তাম্রলিপ্ত' বন্দরকে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই নির্বাচন করেছে এবং তাঁর এই সচেতনতা যুগলাঙ্গুরীয়ের কাহিনী সূচনাতেই তাম্রলিপ্ত বন্দর সম্পর্কে পাদটীকা প্রদান করে স্পষ্ট করেছেন। তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে তিনি পাদটীকায় লিখেছেন — " আধুনিক তামলুক। পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে, পূর্বকালে এই নগর সমুদ্রতীরবর্তী ছিল।" [২৪]

'তাম্রলিপ্ত' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের 'মান্দারণ' গ্রাম এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের 'সপ্তগ্রাম' এর কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। যাদের অতীত সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র একদা দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন। তাম্র-লিপ্তের ইতিহাস ও সমৃদ্ধির - গৌরব মান্দারণ ও সপ্তগ্রাম অপেক্ষা প্রাচীন ও উজ্জ্বল। সুতরাং তাম্রলিপ্তকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে দুর্বলতার জন্ম হওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের মনে হয়, যুগলাঙ্গুরীয় যেন এক সুবৃহৎ উপন্যাসের খসড়া মাত্র। এই উপন্যাসের খসড়া মাত্র। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সম্ভব বীর্যবান, সংকল্পে দৃঢ়, নৌ-বিদ্যায় দক্ষ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির এক ঐশ্বর্যোজ্জ্বল রূপ আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়নি।

॥ চন্দ্রশেখর ॥

চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হবার সময় উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন — " ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 'সয়ের-উল-মতাক্ষরীন' নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে ; ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি । ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।" [২৫] " বঙ্কিমচন্দ্র যে এই গ্রন্থ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তা' রামদাস সেনের গ্রন্থাগারের সয়ের মতাক্ষরীণ গ্রন্থ দেখলেই বোঝা যায় ।" [২৬]

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দুটি সমান্তরাল কাহিনী আছে, — একটি প্রতাপ – শৈবলিনী – চন্দ্রশেখর কাহিনী, অপরটি মীরকাসেম - দলনী - গুরগণ খাঁ কাহিনী। একটির বিষয় কাল্পনিক, অপরটি ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক অংশের নায়ক বাংলার নবাব মীরকাসেম।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে, সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি, নবাব আলিজা, মীরকাসেম খাঁ, মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙমহলে, আপন প্রিয়তমা বেগম দলনীকে জানিয়েছেন যে, তাঁর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ অনিবার্য। এই যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করতে তিনি দলনীকে বলেছেন — " .... ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই।" [২৭] মীরকাসেমের এই বক্তব্য ঐতিহাসিক সত্য।

মীরকাসেম ইংরেজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের অনিবার্যতাকে দলনীর কাছে আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেছেন — " যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, " রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর। ' কেন আমি তাহা করিব ? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব — অনর্থক কেন পাপ ও

কলঙ্কের ভাগী হইব। ? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি — বা মীরজাফরও নহি।" [২৮]
মীরকাসেমের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন — "The new Nawab (Mir-Kashim) was very different man from his father-in-law. Able and ambitious, though suspicious and unwarlike he was adept in the cyhical and pitiless politics of the time, and determined to assert his indipendence at the earliest opportunity." [২৯]

মীরকাসেম কেবল স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়চরিত্রের মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থ প্রজানুরঞ্জক রাজা। স্বাধীন ভাবে নবাবী করে তিনি প্রজার মঙ্গল-সাধন করতে চেয়েছিলেন ; ইংরেজের গোলামী করে প্রজাপীড়নকে তিনি অধর্ম মনে করতেন। এই কারণেই ইংরেজের সঙ্গে মীরকাসেমর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এখন মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা' আমরা উদ্ধৃত করছি —

"By an imperial firman the English Company enjoyed the right of trading in Bengal without the payment of transit dues or tolls. But the servants of the company also claimed the same privileges for their private trade. The Nawabs had always protested against this abuse, but the members of the council being materially interested, the practice went on increasing till it formed a subject of serious dispute between Mir Kasim and the English. At last towards the end of 1762 Vansittart met Mir Kasim at Monghyr, where the Nawab had removed his capital, and concluded a definite agreement on the subject. The council at Calcutta, however, rejected the agreement. Thereupon the Nawab decided to abolish the duties altogether; but the English clamoured against this and insisted upon having preferential treatment as against other traders. Ellis, the chief of the English factory at Patna,

violently asserted what he considered to be the rights privileges of the English and even made an attempt to seize the City of Patna. The attempt failed and his garrison was destroyed, but the events led to the out break of war between the English and Mir Kasim (1763)." [৩০]

বঙ্কিমচন্দ্র যে 'সয়ের মুতাক্ষরীন' গ্রন্থটি অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই তখন, যখন দেখি যে, দলনী বেগমের অনুরোধে যুদ্ধের সময় দলনী বেগম কোথায় থাকবেন তা জানবার জন্য নবাব মীরকাসেম জ্যোতিষ মতে গণনা করছেন। মুতাক্ষরীনে বলা হয়েছে যে, মীরকাসেম জ্যোতিষশাস্ত্রে কিঞ্চিৎপারদর্শী ছিলেন এবং এই শাস্ত্রে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল।[৩১]

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের, প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যে, পরিচারিকা কুলসম্ দলনী বেগমকে সংবাদ দিল যে, গুরুগণ খাঁ ইংরেজদের দু'টি অস্ত্র-বোঝাই নৌকা আটক করেছেন। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদের আশঙ্কায় হব্রাহিম খাঁ নৌকা ছেড়ে দিতে বলছেন, কিন্তু গুরুগণ খাঁ বলছেন, লড়াই বাধে বাধুক নৌকা ছাড়ব না। নৌকা আটকের এই ঘটনা ইতিহাস সম্মত। ইতিহাসে আছে — ".... Gurghin Qhan wanted to stop, whilst Mr.Amyat insisted upon the boat's being dismissed without being stopped or even searched; and to that forbearance the court would not listen, Aaly Ibrahim-Qhan objected to the boats being stopped or visited at all. He contended, that if peace was in contemplation, there was no colour for stopping the boat." [৩২]

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুগণ খাঁর পরিচয় বিবৃত করে বলেছেন — " এই সময় বাঙ্গালায় যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুরুগণ খাঁ একজন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আরমাণি ; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান ; কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান

সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল ; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমত ভরসা ছিল যে, তিনি গুরগণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুরগণ খাঁর আধিপত্যও তদনুরূপ হইয়া উঠিল ; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না ; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুরগণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।"[৩৩]

উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁর কেবল বাইরের পরিচয়ই নয় ; তার অন্তরের পরিচয়ও দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন গুরগণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'এখন কোন্ পথে যাই ? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্রবিশেষ – যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গুনিলে কি হইবে ? দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম — এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষে অস্থির। আমিই বাঙ্গালার কর্তা। আমি বাঙ্গালার কর্তা ? কে কর্তা ? কর্তা ইংরেজ ব্যপারী — তাহাদের গোলাম মীরকাসেম ; আমি মীরকাসেমের গোলাম — আমি কর্তার গোলামের গোলাম ! বড় উচ্চপদ ! আমি বাঙ্গালার কর্তা না হই কেন ? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? ইংরেজ!একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি — মীরকাসেমকে গ্রাহ্য করি না – যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মসনদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদ আরোহণের সোপান — এখন ছাদে উঠিয়াছি – মই ফেলিয়া দিতে পারি। কন্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে – আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাহাদের তাড়াইব। এখন মীরকাসেম মস্‌নদে থাক; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ।"[৩৪]

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে, গুরগণ খাঁ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য। সয়ের মুতাক্ষরীণে তেমন বর্ণনাই আছে। মুতাক্ষরীণ বলে "..... an Qhadja bedross was put at the head of the artillery, with orders to new-model it after the European fashion; and likewise to discipline the musqueteers in his (Mir Cassem Qhan's) service after the English manner."[৩৫]

গুরগণ আপন দক্ষতায় সেনাবাহিনীর প্রধান হয় এবং সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করে ইংরেজ বাহিনীর তুল্য করলে নবাব মীরকাসেম গুরগণের অনুগত হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে মুতক্ষরীণের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "Gurghinqhan, the Armenian .... was the Principal General of his troops, and the trusty confident of his heart; nay, the Nawab seemed to have sold himself to him totally."[৩৬] ফলতঃ ক্রমশ গুরগণ খাঁ একটি ক্ষুদে নবাব হয়ে ওঠেন। গুরগণ খাঁর এই প্রতিপত্তিতে অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল আলি ইব্রাহিম খাঁর একটি চিঠিতে তার পরিচয় আছে। আমরা চিঠিটির ইংরেজী অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃতি করছি —

"Since the advice and counsels offered your well-wishers, and which your mind approves, never fail in the evening to be obliterated by Gurghin-qhan's suggestions, it is needless that either your Highness, or your friends and well-wishers, should fatigue themselves any more upon an infructuous subject; for in the end, we shall find nothing is done, but what has been adviced by Gurghin qhan .... Let us all do as he shall did, ... it is but what happens everyday."[৩৭]

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে গুরগণ খাঁর যে পরিচয় দিয়েছেন তা' মূলতঃ সয়ের মুতাক্ষরীণ অনুসারে। গুরগণ খাঁ অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং আপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য নিয়মিত ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এ সংবাদ

নবাবের কর্ণগোচর হলে গুরুগণ খাঁকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। মুতাক্ষরীণে নবাবের বিরুদ্ধে গুরুগণ খাঁর গোপন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে : — The causes, which no one dared to mention, are a conspiracy, said to be brewing by Gurghin-qhan, incited underhand by the English". [৩৮]

এ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন — " মীরকাসিমের একান্ত বিশ্বাসভাজন খোজা গ্রেগরী ওরফে গর্গিন খাঁ যে সত্য সত্যই ইংরেজদিগের সহায়তা সাধন করিয়াছিলেন, মেজর আদমস যখন কলিকাতায় তাঁহার হত্যার সংবাদ প্রেরণ করেন, তৎকালে তাহার আভাস প্রদান করিয়াছিলেন।" [৩৯]

মীরকাসেম অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নবাব ছিলেন। " ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, জগৎ শেঠ তাঁহাদিগকে পূর্ণ সহায়তা করিতেছেন। এই সময়ে জগৎ শেঠ মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে ও জাফর আলী খাঁকে যে সমস্ত পত্র লেখেন, তাহার কতকগুলি মীরকাশিমের হস্তগত হয়। এ জন্য নবাব জগৎশেঠ মহতাবচাঁদকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁর প্রতি আদেশ পাঠান। তকী খাঁ তাঁহাদিগকে কোনরূপ অপমানিত না করিয়া হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। পরে নবাবের সেনাপতি আর্মেনীয় মার্কার নবাবের আদেশে সসৈন্যে তাঁহাদিগকে লইতে উপস্থিত হইলে, তকী খাঁ তাঁহাদিগকে মার্কারের হস্তে সমর্পণ করেন। এই সময়ে নবাব কাশেম আলি খাঁ মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেন। মার্কার তাঁহাদিগকে লইয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হন। নবাব শেঠদিগের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া মুঙ্গেরে একটি কুঠী স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করেন। অত:পর তিনি তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ; কিন্তু পাছে ইংরেজদিগের সহিত পুনর্বার শেঠদিগের মন্ত্রনা আরম্ভ হয়, তজ্জন্য যাহাতে তাঁহারা অধিক দূর ভ্রমণ করিতে না পারেন, সে বিষয়ে স্বীয় অনুচর দিগকে সতর্ক করিয়া দেন।" [৪০]

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও জগৎশেঠদের ইংরেজ ও গুরুগণ খাঁর সঙ্গে গোপন মন্ত্রনাকে মীরকাসেম রোধ করতে পারেন নি। উপন্যাসের পঞ্চম খন্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুগণ খাঁর সঙ্গে সুরূপচাঁদ ও মহতাবচাঁদ, জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের গোপন

মন্ত্রণার চিত্র এঁকেছেন। ডঃ বিজিত কুমার দত্ত বলেন — " চন্দ্রশেখর উপন্যাসে গুরগণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের রাজনীতির একটি সজীব চিত্রের অবতারণা করেছেন। জগৎশেঠদের মন্ত্রনা সে যুগের ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। জগৎশেঠদের হাতে রাখতে না পারলে সে কালে কোনো নবাবই সিংহাসনকে সুরক্ষিত মনে করতেন না। গুরগণ মীরকাশিমের সঙ্গে জগৎশেঠদের মনোমালিন্যের সুযোগে নিজের ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছিল। পলাশী যুদ্ধের পর নবাব এবং নবাব অনুচরবৃন্দ সকলেই দেশের স্বার্থ অপেক্ষা আপন আপন স্বার্থ বেশী দেখেছিলেন। দেশীয় এবং বিদেশীয় সকলের সম্বন্ধেই একথা খাটে। বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণের জগৎশেঠের সঙ্গে মন্ত্রনার মধ্যদিয়ে সেই অবস্থাকেই পরিস্ফুট করেছেন।"[৪১]

অবশ্যই মীরকাশেম স্বতন্ত্র প্রকৃতির নবাব ছিলেন — যাঁর সঙ্গে অন্য নবাবদের তুলনা চলে না। তিনি প্রজার বৃহত্তর কল্যাণের প্রত্যাশী ছিলেন, এবং সে কারণে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। " ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরগণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাণ হইল।"[৪২] " মীরকাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হটিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল — আবার যবনসেনা ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলারাসির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন। মীরকাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন।"[৪৩] উদয়নালার যুদ্ধে নবাবের পরাজয় হয়েছিল, উপন্যাসে তার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু তারপরের যুদ্ধ নবাবের উদ্যম ও অবস্থান এবং পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলা নেই।

কিন্তু চন্দ্রশেখর যখন ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন উপন্যাসের শেষ কিস্তিতে, 'পরিশিষ্ট' নামক অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন — " নবাব কাসেম আলি খাঁ উদয়নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎ শেঠদিগকে গঙ্গা জলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন।[৪৪] এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরুর হস্তে বধ করিলেন। এই সকল দুষ্কার্য করিয়া, মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।

গুরগণ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশ ক্রমে উদয়নালা যাইবার জন্য নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদয়নালা পর্যন্ত যান নাই — নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন। ভাবগতিক বুঝিয়া নবাবের সঙ্গে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ কৌশল করিতেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথি মধ্যে নবাব সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুরগণ খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিল।

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজভ্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন — বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা, রাজভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।" [৪৫]

মীরকাসেমের ভাগ্যবিপর্যয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক লিখেছেন —

"On 10th June Major Adams took the field against Mir Kasim with about 1,100 Europeans and 400 sepoys. The Nawab assembled an army 15,000 strong, which included soldiers trained and disciplined on the European model. In spite of this disparity of numbers,the English gained successive victories at Katwah, Mur - shidabad, Giria, Sooty, Udaynala and Monghyr. Mir-Kasim fled to Patna, and after having killed all the English prisoners and a number of his pfominent officials, went to Oudh. There he formed a confederacy with Nawab Suja-ud-daulat and the Emperor Shah Alam II with a view to recovering Bengal from the English. The confederate army was, however defeated by the English General Major Hector Munro at Buxar on 22nd October,1764. Shah Alam immediately joined the English Camp, and some time later conclu ded peace with the English. Mir-Kasim fled, and led a wandering

life till he died in obscurity, near Delhi, in A.D. 1777". [৪৬]

বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসেমকে বলেছেন বাংলার – "শেষ রাজা ; কেননা মীরকাসেমের পর যাঁহারা নবাব নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।" [৪৭] মীরকাসেম দেশবৎসল, প্রজানুরঞ্জক এবং বিচক্ষণ নবাব ছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম ও বিচক্ষণতার ফলে বাংলাদেশ নানা বিষয়ে উন্নত হয়ে উন্নত হয়ে উঠছিল।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসেমের সেনাপতি মহম্মদ তকী খাঁ-কে বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ ও পরস্ত্রীলোলুপ করে অঙ্কন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই চরিত্রাঙ্কন ইতিহাস – অনুমোদিত নয়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন — " .... নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু (বঙ্কিমচন্দ্র) তকি খাঁর ন্যায় বঙ্গবাসী মুসলমান বীরের কর্তব্য, নিষ্ঠায় ও আত্মবিসর্জনের আনুপূর্বিক ইতিহাস পাঠ করিয়াও উপন্যাস রচনা করিবার সময়ে সে ঐতিহাসিক চরিত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ঢাকিয়া ফেলিয়া, তাহাকে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাপুরুষের কলঙ্ক কালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন।" [৪৮] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের এই অভিযোগ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ।

তকি খাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন — " মীরকাশিমের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাপতিবীরভূম প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তাঁহার নায়কের নাম মহম্মদ তকি খাঁ। সাহসে, কর্তব্যনিষ্ঠায় রণকৌশলে তকি খাঁ সকল দেশেই জনসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে তকি খাঁর ন্যায় প্রভুভক্ত মুসলমান সেনাপতি অধিক থাকিলে ইতিহাসে মুসলমানের নাম কলঙ্কলিপ্ত হইত না।" [৪৯]

মীরকাসেমের এই বিশ্বস্ত বীর সেনাপতির মৃত্যু হয় কাটোয়ার যুদ্ধে। 'সয়ের মুতাক্ষরীণ' গ্রন্থে তাঁর গৌরবময় জীবনাবসান কাহিনী সবিস্তারে কীর্তিত হয়েছে — "On the first wound he received through his shoulder, he cried out in anguish, ya, Aaly, O ! Aaly. Aaga-aly, his steward and

town-man, as well as our friend and neighbour, advice him to retreat and go back. Go back, answered he, and after that slew again this black beared to Mir-Cassem-Qhan ? Never, added he, stroking it at the same time, never. On receiving the second ball through his head, he screamed out Ya Aaly, again and fell down with this words in his mouth." ৫০ এরপর তাঁর মৃত্যু হল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসের, ষষ্ঠখন্ডের, সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে যে ভাবে মীরকাসেমের হাতে তকি খাঁর হত্যাদৃশ্যের অবতারণা করেছেন তা' ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য নয়।

নবাব সিরাজদ্দৌলা মোহনলাল ও মীরমদন নামে দু'জন বিশ্বস্ত ও অগ্রগণ্য সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু মীর কাসেমের তেমন সেনানায়ক ছিলেন মাত্র একজন — মহম্মদ তকি খাঁ। কাটোয়ার যুদ্ধে তকির মৃত্যু নাহলে ইংরেজের বিজয় হত না, আর তকি খাঁ জীবিত থাকলে গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাসেমের পরাজয় হত না। গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাসেমের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বলেছেন —
"It want but one man, a skill full leader, such a man as the Mohammad Taky Khan whom they had lost at Katwa, to make success, humanly speaking absolutely certain. ...." ৫১

আমরা আগেই বলেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র 'সয়ের মুতাক্ষরীণ' গ্রন্থটি অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তকি খাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনকথা তাঁর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তবু কেন তিনি তকি খাঁকে কলঙ্কিত করলেন তার সঠিক কারণ ব্যাখ্যার অযোগ্য। অথচ অপরাপর চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিকতা বজায় রেখেছেন। যেমন আলি ইব্রাহিম খাঁ সম্পর্কে ইতিহাস বলে — তিনি মীরকাসেমের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত সেনাপতিছিলেন — ".... Old brave and loyal officer,

Ali Ibrahim Khan, who clang to his old master with fidelity uncommon in those treacherous days."[৫২] উপন্যাসেও মীরকাসেম আলি ইব্রাহিম খাঁকে বলেছেন — "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই।"[৫৩]

আমীর হোসেন, মহম্মদ ইরফান, মীরনশির, হায়বৎউল্লা, স্বরূপ চাঁদ, মহাতব চাঁদ, অমিয়ট, হে, মার্কার, সমরু, ড্যাম্পিটার্ট, এলিস, ওয়ারেন হেস্টিংস্ প্রভৃতি সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু উপন্যাস মধ্যে এঁদের ভূমিকা নিতান্ত সামান্য। সে কারণে এঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন কম। কেবল ওয়ারেন হেস্টিংস্ সম্পর্কে সামান্য কিছু বলার আছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে হেস্টিংস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন — "ইতিহাসে ওয়ারেন হিস্টিংস্ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কর্মঠলোক কর্তব্যানুরোধে অনেক সময় পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্য রক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন হেস্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য - সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই — তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না — কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে — ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে। ওয়ারেন হেস্টিংস্ দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ট ছিলেন।"[৫৪]

ইতিহাসে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে পরপীড়ন বিষয়ে নানা অভিযোগ আছে। তার মধ্যে তিনটি অভিযোগ গুরুতর — (১) রোহিলা জাতির ধ্বংস সাধন (২) চৈৎসিংহের প্রতি অত্যাচার (৩) অযোধ্যার বেগমদের সম্পত্তি লুণ্ঠন। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র রজুমদার বলেন — "ওয়ারেন হেস্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী নানা মত প্রচলিত আছে। তৎকালীন বিখ্যাত বাগ্মী বার্ক, বিখ্যাত লেখক মেকলে ও ঐতিহাসিক মিল

— এই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হেস্টিংসের নানা অসৎ কার্যের জন্য তাঁহার বহু নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েকজন লেখকের মতে হেস্টিংসের বিশেষ কোন অপরাধ ছিল না। বরং তাঁহার অসাধারণ কর্মকুশলতা ও রাজনীতি জ্ঞানের ফলে বৃটিশ রাজশক্তি দৃঢ় ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।" [৫৫] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই বক্তব্যের পরে আমরা হেস্টিংস্ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারনাকে অবহেলা করতে পারি না। তাছাড়া ইংলণ্ডে 'হাউজ অব্ কমন্স' বাদী হয়ে 'হাউজ অব্ লর্ডস'—এ হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল বিচারে হেস্টিংস্ সেক্ষেত্রে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন। অবশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হেস্টিংস যে অত্যাচার করেছিলেন, সে কথা মিথ্যা নয়।

এই উপন্যাসে দলনী বেগম অনৈতিহাসিক চরিত্র। সুতরাং গুরগণ খাঁর সঙ্গে তাঁর ভগ্নী সম্পর্ক কাজে কাজেই অনৈতিহাসিক। শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরও ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। তবে প্রতাপের মতো তেজস্বী ও বীর্যবান যুবক এবং চন্দ্রশেখরের মত বাস্তব-জ্ঞানবর্জিত, পুঁথিসর্বস্ব ও ক্ষমাসুন্দর বিদ্যাযোগী সে কালে অসম্ভব বা অবাস্তব কল্পনা নয়। এই বাস্তবতা বোধটুকু বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনার অন্তর্ভূত।

॥ সূত্র – নির্দেশ ॥

১। ভবতোষ দত্ত – চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১০৯৪, পৃ: ৯৮।

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১০৯১, পৃ: ১৯২।

৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১০৯১, পৃ: ১৯৩।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, (২য় খন্ড), ১০৯২, পৃ: ৩৩১।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, (২য় খন্ড), ১০৯২, পৃ: ৩৩৭।

৬। রমেশ চন্দ্র মজুমদার – বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১৯৮৮, পৃ: ১৩৩।

৭। Charles Stewart – History of Bengal, 1904, p.47-48.

৮। যোগেশচন্দ্র বাগল – 'উপন্যাস প্রসঙ্গ', 'মৃণালিনী', বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১০৯১, পৃ: ৩১।

৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১০৯১, পৃ: ১৯২।

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।

১১। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কলঙ্ক' প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৫, পৃঃ ৫৩৩–৩৬) বলেছেন যে, বখতিয়ার সহজে বঙ্গদেশ অধিকার করতে পারেন নি; তিনি লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগণা মাত্র অধিকার করতে সক্ষম হন। প্রায় একই সিদ্ধান্ত করেছেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে (নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩০২, পৃঃ ৫৯৭–৬০৬)। এছাড়া যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস গ্রন্থেও সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গজয় কাহিনীর সমর্থন নেই।

১২। Minhaj-I-Siraj — Tabakat-I-Nasiri Trn. by H.G.Raverty, 1970, p.555.

১৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), ১৯৮৮, পৃঃ ১০৫–০৬।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ১৯৩।

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।

১৬। নিখিল নাথ রায় — মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পলাশী, ১৯৭৮, পৃঃ ১৩৪।

১৭। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার — বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, সোমেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত, ১৯৬৪, পৃঃ ১৪।

১৮। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় – উদ্ধৃতি, সাহিত্য প্রসঙ্গ, যোগেশ চন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ২২।

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ১৯৩।

২০। শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্কিম রজীবনী ; অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৮৮, পৃঃ ২২৬–২৭।

২১। নীহার রঞ্জন রায় – বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, চতুর্থ অধ্যায়, ১৯৮০, পৃঃ ২১০।

২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – যুগলাঙ্গুরীয়, সপ্তম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩৪৩।

২৩। যোগেশ চন্দ্র বসু – বঙ্কিম স্মৃতি চিহ্ন, ১৯২৫, পৃঃ ৩১।

২৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – যুগলাঙ্গুরীয়, প্রথম পরিচ্ছেদ (পাদ টীকা), বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩৩৭।

২৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ভূমিকা, চন্দ্রশেখর ; উদ্ধৃতি, উপন্যাস প্রসঙ্গ, যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩৬।

২৬। বিজিত কুমার দত্ত – বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৯, পৃঃ ৯৭।

২৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – চন্দ্রশেখর, প্রথম খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩৫১।

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, প্রথম খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ: ৩৫১।

২৯। V.A.Smith — Oxford History of India, 1958, p. 470.

৩০। R.C.Majumder & Others — An Advanced History of India, 1981, p.663.

৩১। Syed Gholam Hossein — Seir-Mutaqherin Trn. by M.Raymond, 1902, p.387.

৩২। Syed Gholam Hossein — Ibid, p.465.

৩৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ:৩৩২।

৩৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২—৬৩।

৩৫। Syed Gholam Hossein — Seir Mutaqherin Trn. by M.Raymond, 1902, p.389.

৩৬। Ibid, p. 421.

৩৭। Ibid, p. 464.

৩৮। Ibid, p. 502 (Foot Note No.267).

৩৯। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় — মীরকাসিম, ১৩২৮, পৃ: ১৭৯—৮০।

৪০। নিখিল নাথ রায় — মুর্শিদাবাদ কাহিনী, জগৎ শেঠ, ১৯৭৮, পৃ: ৪৫—৪৬।

৪১। বিজিত কুমার দত্ত — প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

৪২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ:৪০৮।

৪৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খন্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ: ৪১০।

৪৪। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করার কথা Ghulam Husain Salim - এর Riyazv-S-Salatin (1904) গ্রন্থে আছে (p.396).

৪৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – চন্দ্রশেখর, পরিশিষ্ট, বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খন্ড, ১৯৮০ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ: ১৭৮–৭৯।

৪৬। R.C.Majumder – An Advanced History of India, 1981, p.664.

৪৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খন্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ: ৪১৮।

৪৮। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় – প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৯–৬০।

৪৯। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় – প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৬।

৫০। Syed Gholam Hossein – Seir Mutaqherin, Tr. by M.Raymond, 1902, p.485 (Foot note - 257)

৫১। Col. Mallesson – Decissive Battles of India, উদ্ধৃতি, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, মীরকাসিম, ১৩২৮, পৃ: ১৫৫ (পাদটীকা)।

৫২। Ghulam Husain Salim – Riyazu-S-Salatin, Trn. & Ed. by Abdus Salam, 1904, p.392 (Footnote).

৫৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪১২।

৫৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪১২।

৫৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলা দেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), ১৯৮১, পৃঃ ২১।